Vol. 51 | No. 2 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুলের প্রবন্ধ পাঠ : একটি পর্যালোচনা

Volume	51
Issue	2
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Munira Sultana
Published online	February 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v51i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i2.7
Pages	১১৯-১২৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

নজরুলের প্রবন্ধ পাঠ : একটি পর্যালোচনা

Check for updates

মুনিরা সুলতানা*

একজন কবি, নাট্যকার, কথাশিল্পী, সঙ্গীতকার কিংবা শিশু-সাহিত্যিক হিসেবে নজরুলের শিল্পিসত্তা থেকে প্রবন্ধকার নজরুলকে ভিন্নতর শ্রেণির লেখক হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) বেশ কিছু প্রবন্ধ সমকালে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় হিসেবে বেরিয়েছিল। তবে সাহিত্যচর্চার অঙ্গ হিসেবে তিনি সচেতনভাবে প্রবন্ধও রচনা করেছেন। তিনি নিজে যেসব রচনাকে প্রবন্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেগুলি প্রথমে প্রকাশিত হয় 'নবযুগ' (১৯২০), 'ধূমকেতু' (১৯২২) আর 'গণবাণী' (১৯২৬) পত্রিকার সম্পাদকীয়তে। *যুগবাণী*, *রুদ্র-মঙ্গল* ও *দুর্দিনের যাত্রী*র অধিকাংশ রচনা এই শ্রেণির। রচনাগুলি প্রথম পর্যায়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩২৬ থেকে ১৩৩৩ সালের মধ্যে, পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার কিছু কাল পরে। *ধূমকেতু*-তে সংকলিত হয় আঠারটি প্রবন্ধ এবং দুটি চিঠি। প্রবন্ধগুলোর একটি 'গণবাণী' থেকে সংগৃহীত। বাকি সবগুলোই সম্পাদকীয় বা প্রবন্ধের আকারে 'ধূমকেতু'-তে আত্মপ্রকাশ করে। নজরুলের বিখ্যাত রচনা *রাজবন্দীর জবানবন্দী* গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। রচনাটি রাজদ্রোহের অভিযোগে ধৃত কবির লিখিত জবানবন্দি। এটি পরে *প্রলয়-শিখা* কাব্যগ্রন্থের পরিশিষ্ট রূপে সংকলিত হয়। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র প্রাথমিক উদ্দেশ্য যা-ই থাক না কেন, একে *যুগবাণী*, *রুদ্র-মঙ্গল*, *দুর্দিনের যাত্রী* আর *ধূমকেতু*র রচনাগুলির মতই 'ব্যাপক অর্থে প্রবন্ধ হিসেবে স্বীকার করে নেয়া যায়।' (আতোয়ার, ১৯৯৪ : ৬৯)

১.১

নজরুলের কবিতা, উপন্যাস কিংবা অন্যান্য রচনা মূল্যায়নের প্রবণতা কিংবা চর্চার আধিক্যের তুলনায় তাঁর প্রবন্ধবিষয়ক সমলোচনার সংখ্যা কম। সাধারণভাবে প্রবন্ধসাহিত্য বলতে যা বোঝায়, নজরুলের প্রবন্ধকে সেই মানদণ্ডে বিচারের ক্ষেত্রে সৃষ্ট অসুবিধা এর কারণ হতে পারে। তবে রচনাগুলোকে প্রবন্ধ হিসেবে গ্রহণ করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা — অধিকাংশের বিষয়বস্তুর সাময়িকতা। প্রবন্ধকার নজরুল বিষয়ে বিভিন্ন মূল্যায়ন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তাঁর প্রবন্ধ মূলত গুরুত্ব পেয়েছে বিষয়বস্তুর সাময়িকতার জন্যই। আবার কখনও এর রূপ তথা ভাষার লালিত্যের কারণে। নজরুলের প্রবন্ধের বিষয়গুলোর মধ্যে একটি সাধারণ চারিত্র্যলক্ষণ আছে, সেটা হচ্ছে সাময়িকতা। এ প্রসঙ্গেই মূল্যায়িত হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা। ১৯০৫ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বিশ্ব, বিশেষত ভারতবর্ষের সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক ইতিহাস, নজরুল-সাহিত্য ব্যাখ্যায় অপরিহার্য পটভূমি হিসেবে বিবেচিত। তাঁর প্রবন্ধ-সমালোচনায়ও তা বিবৃত হয়েছে। তাঁর রাজনীতি-চেতনার

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বরূপ এই সূত্রেই নির্ণীত হয়েছে। ১৯১৯-এ তিনি যখন দেশে ফেরেন, ভারতে ব্রিটিশবিরোধী গণবিক্ষোভ শুরু হয় প্রায় তখন থেকেই; বিশেষত সন্ত্রাসবাদ, ১৯২০-এর সেপ্টেম্বরে কংগ্রেসের বিশেষ কলকাতা অধিবেশনে গৃহীত মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব, খিলাফত আন্দোলন ইত্যাদি চলছে। এ বছরই সান্ধ্যদৈনিক 'নবযুগে' (১৯২০) নজরুল তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলো লিখছিলেন, যার কিছু অংশ নিয়ে *যুগবাণী* (১৯২২) প্রকাশিত হয় এবং তিন মাসের মধ্যেই তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। *যুগবাণী*র প্রথম প্রবন্ধ 'নবযুগ'-এ বিশ্বব্যাপী গণজাগরণ সম্পর্কে নজরুলের সচেতনতা লক্ষণীয়। রুশ বিপ্লব, আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রাম, নব্যতুর্কী আন্দোলন, সামন্তবাদ-উপনিবেশবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী 'বৈশ্বিক বিদ্রোহ-বিপ্লবের তরঙ্গাভিঘাতে আন্দোলিত নজরুল দেখেছেন পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিস্বপ্ন।' (সিদ্দিকা, ১৯৯৯ : ৫২৭)। তাঁর রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে সন্ত্রাসবাদ আর বাংলার তরুণ সমাজ একটি বড়ো অংশ— বস্তুত মুখ্যভাগ — জুড়ে আছে। জাগরণের বক্তব্যই এগুলোর প্রধান বাণী। এই ধরনের প্রবন্ধ রচনায় নজরুলের অনুপ্রেরণা সম্পর্কে প্রায় সকল সমালোচকই একমত যে, একটি পরাধীন দেশের যন্ত্রণা, স্বসমাজ ও প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের পারস্পরিক সহাবস্থান সত্ত্বেও উপজাত সমস্যা-সংঘাত, ধনবান-ধনহীনের বৈষম্য, অশিক্ষা কুসংস্কারের প্রবল পীড়ন এবং সর্বোপরি মনুষ্যত্বের অপমান ও লাঞ্ছনা তাঁর সত্যসন্ধ স্পর্শকাতর হৃদয়ে যে তীব্র আলোড়ন তুলেছিল, প্রবন্ধসমূহে তার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগময় প্রকাশ ঘটেছে। সমালোচক বলেন :

> অবিভক্ত বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত 'মন্দির ও মসজিদ' এবং 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধ দুটি (রুদ্র-মঙ্গল) বিশের দশকের অপরার্ধের সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার দলিল। ... সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে নজরুলের আগে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে আর কেউ বাংলা ভাষায় লেখেন নি, ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও ঐ সমস্যা সম্পর্কে কেউ অমনভাবে লিখেছিলেন কিনা সন্দেহ। (মনোয়ারা, ২০০০ : ৪৯)।

সাম্প্রাদায়িকতার তীব্র বিরোধী নজরুলের সাম্যবাদী চেতনা বা ঘোষণা একজন 'মার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিকের মতোই' (বিশ্বজিৎ, ১৯৯৩ : ৫৬)। স্বরাজদলের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় ১৯২৬ সালে 'গণবাণী' পত্রিকার সাম্যবাদী আদর্শের যে সমালোচনা করা হয়েছিল তার উত্তরে উক্ত পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত যে পত্র দিয়েছিলেন নজরুল, সেটা 'তাঁর রাজনৈতিক চেতনার স্পষ্ট পরিচয় বহন করে।' (মনোয়ারা, ২০০০ : ৫০)। পত্রে তাঁর বক্তব্য :

> 'গণবাণী'র লেখা নিয়ে 'তারা-রা' বলেছেন — বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা কয়েক মতবাদ শিখলে ওগুলো শিগগীর বুঝতে পারবেন?... তিনি কি জানেন না, যেকোন দেশের কোন শ্রমিক কার্ল মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' পড়ে বুঝতে পারবেন না। ঐ মতবাদটা যারা পড়বে তারা কৃষক শ্রমিক নয়, তারা লেনিন-ল্যান্সব্যারীর নমুনার লোক। (নজরুল, ১৯৯৭ : ২৩৮)

অর্থাৎ জনসাধারণ বা সাধারণ শ্রমিক কার্ল মার্কসের মতবাদ-তত্ত্ব বুঝতে না পারলেও ক্ষতি নেই, কারণ এ মতবাদ এমন কতগুলো মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যারা জগতকে নতুন করে গড়ছেন। একটি গণ-অভ্যুত্থান, সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা কিংবা সশস্ত্র বিপ্লব তথা স্বাধীনতা

সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব গড়ে তোলা প্রয়োজন সর্বাগ্রে, এ প্রসঙ্গে নজরুলের নিম্নোক্ত বক্তব্যের গুরুত্ব সমালোচক উল্লেখ করেন। নজরুল বলেন :

> মতবাদ তৈরী করে তুলবে সেই রকম লোক যারা বুঝোবেন এ (মার্কসীয়) মতবাদের মর্ম জনসাধারণকে। 'গণবাণী'ও কৃষক শ্রমিকদের পড়ার জন্য নয়, কৃষক শ্রমিকদের গড়ে তুলবেন যাঁরা 'গণবাণী' তাঁদেরই জন্য। (নজরুল, ১৯৯৭ : ২৩৯)

নজরুলের উক্ত বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে সমালোচক বলেন :

> বিশের দশকে ভারতে বিশেষত বাংলায় রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে যে সাম্যবাদী ভাবধারা প্রসারিত হয়েছিল তার প্রতিফলন বিশের দশকের অপরার্ধে নজরুলের বিভিন্ন রচনায় সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। নজরুল 'নবযুগ' পত্রিকার সময় ছিলেন অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের পটভূমিকায় পরধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামী, 'ধূমকেতু' পত্রিকায় সশস্ত্র বিপ্লববাদের মুখপাত্র, 'লাঙ্গল' ও 'গণবাণী' পত্রিকায় শ্রেণি সংগ্রামী, শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, অর্থনৈতিক মুক্তিরও প্রবক্তা। বিশের দশকের রাজনীতির তিনটি ধারাবাহিক ক্রমবিকাশকে ধারণ করেছেন নজরুল — ঐসব পত্রিকাকে কেন্দ্র করে, তার বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে। ... সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হলেও প্রবন্ধগুলির মূল্য সমকালেই নিঃশেষ হয়ে যায়নি বরং উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অধ্যায়ের ইতিহাসের দলিলরূপে রাজনৈতিক সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। (মনোয়ারা, ২০০০ : ৫০)

এছাড়া নজরুলের রাজনৈতিক প্রবন্ধ শুধু যে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করার জন্যই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার এবং আমলাতন্ত্র, সামন্তবাদ ও মৌলবাদের বিরুদ্ধেও বলিষ্ঠ উচ্চারণ তারও স্বীকৃতি মেলে সমালোচকের বক্তব্যে—

> নজরুলের রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী একাধারে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, বিদেশী ও স্বদেশী শোষণ, সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা, বর্ণাশ্রম শাসিত সমাজব্যবস্থা এবং সাম্প্রদায়িকতা তথা মৌলবাদের বিরুদ্ধে বিশের দশকের শেষ অবধি বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ রচনা। (মনোয়ারা, ২০০০ : ৫৯)।

'বিদ্রোহ ও বিপ্লব ছাড়া মুক্তিলাভ সম্ভব নয়, এরকম ধারণা নজরুলের জীবন-দর্শনের অন্তর্গত' (আতাউর, ১৯৯১ : ৬৫)। তাঁর বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ধারণাটি অনেকাংশে 'নৈরাজ্যবাদী তথা সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির পরিপূরক।'[১]— সমালোচকের এই মত গ্রহণীয় নয়। নজরুলের কবিতা ও প্রবন্ধই কেবল নয়, তাঁর প্রায় সকল শিল্পকর্ম, তাঁর কর্মজীবন একটি অবিচ্ছিন্ন অনমনীয় ও আপসহীন সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ বিপ্লবী আন্দোলনের সমকালীন ও বৈশ্বিক ইতিহাসেও শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রচারপত্রের মর্যাদা পেতে পারে অনায়াসে। সমকালে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক চেতনা-উদ্দীপনের ক্ষেত্রে প্রবল প্রভাবশালী এসব রচনাকে কোনোক্রমেই সীমায়িত দৃষ্টিকোণে থেকে বিচার করার উপায় নেই। নজরুলের রচনায় থাকা কঠোর সংগ্রামের ঘোষণা বিপ্লবীদের উগ্র করে তুলতে পারত, কিংবা তা স্বাধীনতার নামে ক্ষতিকর নৈরাজ্যবাদী রাজনীতিকে উস্‌কে দিয়েছে তা বলা যায় না। ১৩২৯ সালের ২৬ আশ্বিন (১৯২২) তারিখের 'ধূমকেতু'তে তিনি লেখেন : "সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের স্বাধীনতা

চায়।" এ পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের অনেকগুলো অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধ জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এর স্মৃতিচারণে লিখেছেন :

> সপ্তাহান্তে বিকেলবেলা আরো অনেকের সঙ্গে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, হকার কতক্ষণে 'ধূমকেতু'র বাণ্ডিল নিয়ে আসে। হুড়োহুড়ি, কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কাগজের জন্য। কালির বদলে রক্তে ডুবিয়ে ডুবিয়ে লেখা সেই সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। সঙ্গে "ত্রিশূলে"র আলোচনা। শুনেছি, স্বদেশী যুগের "সন্ধ্যা"তে ব্রহ্মবান্ধব এমন ভাষাতেই লিখতেন। সে কী কশা, কী দাহ! একবার পড়ে বা শুধু একজনকে পড়িয়ে শান্ত করবার মত সে লেখা নয়। যেমন গদ্য তেমনি কবিতা। সব ভাঙার গান, প্রলয়-বিলয়ের মঙ্গলাচরণ। (উদ্ধৃত, অচিন্ত্যকুমার, ১৪০৯ : ৪৬-৪৭)

১৩২৯ সালের ১৪ কার্তিকের 'ধূমকেতু'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'আমি সৈনিক'-এ নজরুল লেখেন :

> এখন দেশে সেই সেবকের দরকার যে সেবক দেশ-সৈনিক হতে পারবে।
> ... রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, প্রফুল্ল বাংলার দেবতা তাঁদের পূজার জন্যে বাংলার চোখের জল চিরনিবেদিত থাকবে। কিন্তু সেনাপতি কৈ? সৈনিক কোথায়? কোথায় আঘাতের দেবতা, প্রলয়ের মহারুদ্র?

এছাড়া স্মরণীয় যে, 'ধূমকেতু'তে নজরুল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করেন, ১৯২১ সাল পর্যন্ত ভারতের জন্যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি কোনো রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যভাবে উত্থাপন করেন নি। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবশেনে 'মোসলেম রিপাবলিক' দলের নেতা মওলানা হস্‌রৎ মোহানী পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করেছিলেন কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতায় প্রস্তাবটি অধিবেশনে গৃহীত হয়নি। সুতরাং '১৯২২-এ ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন কেবল সাহসী নয় ঐতিহাসিক ঘটনাও বটে।' (রফিকুল, ২০১২ : ৮০১) আর এই দাবি উত্থাপন ও তা বাস্তবায়নের বিকল্পহীন পন্থা হিসেবে বিদ্রোহের আহ্বান এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের সৈনিক রূপে বিদ্রোহের স্বাভাবিক পরিণতি ছিল রাজদ্রোহিতার অভিযোগে নজরুলের বিচার। *রাজবন্দীর জবানবন্দী* (১৯২৩) তারই ফলে বাংলা সাহিত্যে সংযোজিত হয়। আদালতের কাঠগড়ায় দেয়া এ জবানন্দির মধ্যে পরাধীনতার ক্ষোভ ও স্বাধীনতার যে অকুণ্ঠ ও জোরালো দাবি ছিল, পাঠককে সেটা সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে :

> আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। ... এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? ... এই শাসন-ক্লিষ্ট বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী? (নজরুল, ১৯৯৭ : ৭৮)

রাজবন্দীর জবানবন্দী প্রসঙ্গে সমালোচকের মতামত হলো :

> নজরুল এই বিচারকে প্রহসন আখ্যা দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ যীশু এবং রাজবন্দী মহাত্মা গান্ধীর উপমা টেনে এনেছেন। ... 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' যে নজরুলের আত্মজৈবনিক ভাষণও বটে তার প্রমাণ তাঁর জবানীতেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। (মনোয়ারা, ২০০০ : ৫৩-৫৪)

নজরুল বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসকে স্পষ্ট করতে পেরেছিলেন। যদিও বলা হয়, 'তাঁর প্রবন্ধগুলোতে আবেগোচ্ছ্বাস যতটা, সেই পরিমাণে যুক্তিতর্ক বিচার বিশ্লেষণ নেই' (সুশীলকুমার, ১৯৯৯ : ৪৭৪)। অর্থাৎ নজরুলের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা রূপান্তরিত হয়েছে সহজাত আবেগে এবং তা প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্লেষণ, ইতিহাসধারায় সম্যক জ্ঞান ও নিরন্তর পঠন-পাঠন এবং 'সমাজ প্রবাহের আন্তরিক উপলব্ধির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সমাজ-রাজনীতি সচেতনতা'[২] অপরপক্ষে অতিসংবেদী মন, আবেগ-অনুভূতির পথে স্বকালকে উপলব্ধি করে ভাব-বিপ্লবী (romantic rebel) হওয়ার মাঝে পার্থক্য আছে বলেও সমালোচকের মত রয়েছে। (হায়াৎ, ১৯৯৯ : ৯)। কিন্তু নজরুলের রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক আদর্শ অস্পষ্ট ছিল না, সমাজ ও জীবন সম্পর্কে বাস্তবনিষ্ঠ অনুধ্যানও তাঁর ছিল, ছিল নিজস্ব মানবিক মূল্যবোধ। এছাড়া সাম্যবাদ সম্পর্কিত তাঁর অভিমতগুলো 'কাল মার্কসের বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ থেকে দূরে নয় এবং তা মানবেতিহাসের বিপ্লবী প্রয়াস সম্পর্কে জাগ্রত ছিল।' (আতাউর, ১৯৯১ : ৭২-৭৫)।

জাতীয়তাবাদ বিষয়ে নজরুলের ধারণা মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বের সঙ্গে পঠিত হয় 'বাঙালির বাঙলা' (*নবযুগ*, ১৩৪৯), 'আমার লীগ কংগ্রেস' (*নবযুগ*, ১৯৪১) এবং *যুগবাণী, দুর্দিনের যাত্রী* ও *রুদ্র-মঙ্গলের* প্রবন্ধসমূহ। 'বাঙালির বাঙলা' প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন : 'নজরুলের *বাঙালীর বাঙলা* একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। কারণ বাংলা ও বাঙালির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এই প্রবন্ধে নির্দেশিত। বাঙালির মুক্তির মন্ত্র নজরুলের এই প্রবন্ধে নিহিত।' (মনোয়ারা ২০০০ : ৫৯)। নজরুলের জাতীয়তাবাদী চেতনার সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ দিক হলো তিনি বাঙালির স্বাধীন সত্তাটাই কামনা করেছেন সর্বাগ্রে যেখানে উগ্র জাতীয়তা বা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী মনোভাবের কোনো স্থান নেই। "আমি 'লীগ' 'কংগ্রেস' কিছুই মানি না, মানি শুধু সত্যকে মানি সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে, মানি সর্বজনগণের মুক্তিকে" 'আমার লীগ কংগ্রেস' প্রবন্ধে নজরুলের এই ঘোষণা তা প্রমাণ করে। হিন্দুজাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থানের কালেই তিনি সংকীর্ণ পরিবেশ ও সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে আপ্রাণ সংগ্রাম করেছেন। সমালোচক বলেন :

> নিজকে তিনি সর্বদাই জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে রেখেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বাংলা সাহিত্যে অনন্য ও অদ্বিতীয়। তিনি বলেন, 'কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের, আমি বলি, ও দু'টোর কিছুই নয়।' শুধু ধর্মীয় কেন, ভৌগোলিক জাতীয়তাও তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, 'এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশের এই সমাজের নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের।' ... একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে নজরুল সর্বত্রই মানুষকে ধর্ম ও জাতীয়তার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। (আতাউর, ১৯৯১ : ৮১)

১.২

সমকাল-প্রভাবিত নজরুল-প্রবন্ধসমূহে বিশ শতকের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক রূপ ছাড়াও সামাজিক অবস্থার, সমকালীন জনমানসের চিন্তা-চেতনা, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, প্রত্যাশা, অচরিতার্থতার বেদনা ও যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিশের দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষভাবে নজরুলের প্রবন্ধে গুরুত্ব পেয়েছে। তুলনায় ত্রিশের

দশকে প্রাধান্য পেয়েছে সাহিত্য সঙ্গীত শিক্ষা অর্থাৎ সংস্কৃতি। 'বিশের দশকে রচিত প্রবন্ধ কবির সাংবাদিক জীবনের ফসল, অন্যদিকে ত্রিশের দশকের রচনা তাঁর সঙ্গীত ও সাহিত্য সাধনার ফল। (মনোয়ারা, ২০০০ : ৬০)। বাঙালি মুসলমান সমাজের অবস্থা ছাড়াও নজরুল-প্রবন্ধে সমকালীন ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষের খেটে খাওয়া জীবন তথা সামাজিক দুরবস্থার চিত্র বিধৃত হয়েছে। যেমন — 'ধর্মঘট' (*যুগবাণী*), 'লাঞ্ছিত' ও 'লাঙল'। 'লাঞ্ছিত' প্রবন্ধে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের স্বরূপ তুলে ধরেছেন নজরুল। 'তিনি দেখিয়েছেন, দু'ভাবে আমাদের সাধারণ মানুষ শোষিত হয়েছে; একদিকে বিদেশীরা আমাদের ধর্ম ও সমাজকে শাসন করেছে, অন্যদিকে বর্ণাশ্রম শাসিত সমাজে মানুষ ধর্ম ও সমাজের নামে শোষিত হয়েছে।' (মনোয়ারা, ২০০০ : ৬৩)

ঔপনিবেশিক শাসন-পর্বে অবিভক্ত কৃষকশ্রেণির চিত্র, শ্রেণিবৈষম্য, যুদ্ধোত্তর পরিবেশে স্বার্থান্বেষী মানুষের পারস্পরিক স্বার্থ তথা ভূমিসমস্যা, আর্থ-সামাজিক কাঠামোর প্রভাবে নগরায়ণ ও গ্রাম-বাংলার প্রাচীন সভ্যতার দ্বন্দ্ব, জমিদারি ব্যবস্থা তথা ভূমি সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্মতন্ত্র, স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার না হওয়ার পেছনে দায়ী ভারতবাসীর ধর্মীয় অর্থনৈতিক পেশাগত অনৈক্য, সাংগঠনিক ব্যর্থতা, আমলাতন্ত্র ইত্যাদিসহ নজরুল-প্রবন্ধে বিধৃত সমকালীন সামাজিক বিচিত্র প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ সমালোচকেরা অনুসন্ধান করেছেন। বিশেষত ঔপনিবেশিক শোষণ, সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিদ্বেষের বিপরীতে নজরুলের সমাধানপ্রয়াসী উচ্চকণ্ঠ সার্বজনীন ও সময়োত্তীর্ণ মূল্য পেয়ে বিবেচিত হয়েছে। মূল্যায়িত হয়েছে নজরুলের ধর্মবোধ, শিক্ষা-চিন্তা, তাঁর স্বদেশপ্রেম, বিশ্ববোধ ও সমাজ-চেতনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্য দিকগুলোও। ভারতবাসীর ধর্মীয় তথা সম্প্রদায়গত অনৈক্য ও নজরুল-চিন্তা প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত হলো :

> সাম্প্রদায়িক কলহের দুর্বলতা দিয়ে ভারতের মুক্তি সম্ভব নয়। নজরুল এ-কারণেই ভারতীয়দের শক্তির দুর্বলতর সূত্রগুলি এ-পর্বের (যুগবাণী) সম্পাদকীয় রচনায় বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি জানতেন হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ শক্তির দুর্বার আঘাতেই ব্রিটিশ শাসনশৃঙ্খল ভাঙা সম্ভব। নজরুল আহ্বানও জানিয়েছেন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের। (আকরম, ১৯৮৫ : ৭৫)
> নজরুল উভয় জাতির (হিন্দু-মুসলমান) ইতিহাস-ঐতিহ্য-চিন্তা-চেতনার ভাব বিনিময়ে গুরুত্বারোপ করেছিলেন, যার ফলে 'next door neighbour'-এর মানসিক দূরত্ব হ্রাস পায়, সাম্প্রদায়িক মত্ততার অবস্থান ঘটে এবং তৃতীয় শক্তির আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ... শুধু পলিটিক্যাল তুবড়িবাজিতে তাঁর আস্থা ছিল না। সৈনিক নজরুল সংঘবদ্ধতার মূল্য জেনেছিলেন। (সিদ্দিকা, ১৯৯৯ : ৫৩৮ ও ৫৪৬)

১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতির ভাষণে নজরুল বলেন :

> ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটাও ভাঙছে — তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু-মুসলামানের, পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা। ('মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা', *রুদ্র-মঙ্গল*)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি কিংবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নেই কেবল নয়, হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনার এই তীব্রতা নজরুলের মানবতাবোধজাত — এ বিষয়েও কোনো সমালোচকের দ্বিমত নেই। নজরুলের প্রবন্ধে-অভিভাষণে প্রকাশিত নানা অনুভবের সঙ্গেই এ প্রসঙ্গে সমালোচক কর্তৃক উদ্ধৃত হয় তাঁর 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত বক্তব্য :

> আমার কেবলই যেন মনে হত আমি মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছি। জাতি-ধর্ম-ভেদ আমার কোনদিনই ছিলনা, আজও নেই। আমাকে কোনোদিন তাই কোনো হিন্দু ঘৃণা করেনি। ব্রাহ্মণেরাও ঘরে ডেকে আমাকে পাশে বসিয়ে খেয়েছেন ও খাইয়েছেন। এই আমি আমার যৌবন-সুন্দর, প্রেম-সুন্দরকে দেখলাম। (নজরুল, ১৯৯৭ : ২০৪)

নজরুলের সমাজবোধ সম্পর্কে সমালোচক বলেন :

> তাঁর দর্শনের লক্ষ্য সাম্য ও কল্যাণ। এ উদ্দেশ্যেই তিনি সর্বপ্রকার বন্ধন ও অধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ... সমাজজীবনের অনাচার অসঙ্গতি তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন— শুধু রাজনৈতিক সূত্র থেকে তা অর্জন করেননি। ... সমাজকে ভেঙে গড়বার স্বপ্ন ও উদ্যম ছিল তাঁর ক্লান্তিহীন। নজরুল-মানসিকতাকে উনিশ শতাব্দীর স্বাধীনতা সাম্য ও মানবতাবোধের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। (আতাউর, ১৯৯৯ : ৩১৪-৩১৭)

এছাড়া নজরুলের সাহিত্যচিন্তার নানা পরিচয় সমালোচকেরা তুলে ধরেছেন; এ পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান' (*যুগবাণী*), 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য', 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রভৃতি প্রবন্ধ। সাহিত্য ব্যক্তিমানসের প্রতিফলন, সাহিত্য প্রাণের উপলব্ধি, মানসিক দৈন্য সাহিত্যকে বিঘ্নিত করে প্রভৃতি নজরুলীয় মতামতকে সমর্থন করে সমালোচকেরা তাঁর সাহিত্যচিন্তা তুলে ধরেন। সংকীর্ণতার গণ্ডি পেরিয়ে মৌলিক সত্য প্রতিষ্ঠা করে তাকে বিশ্ব সাহিত্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা এবং দেশীয় ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে সাহিত্যের সর্বজনীন হওয়ার সার্থকতা বিষয়ে প্রদত্ত নজরুলীয় অভিমতসমূহ বিবেচিত হয়েছে গুরুত্বের সাথে।

১.৩

নজরুল-প্রবন্ধের রূপ-বিচারে সমালোচকেরা মনোযোগী হয়েছেন তাঁর ভাষাভঙ্গি নিয়ে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় নজরুলের প্রবন্ধ সম্পর্কে একথা স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, তা একটা নিজস্ব ও সহজাত ভঙ্গিমায় ঋদ্ধ। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা ও আঙ্গিক যে বক্তব্যকে অনেক বেশি বেগবান ও বলিষ্ঠ করেছে, এ ব্যাপারেও দ্বিমত করেননি কেউ। নজরুল-প্রবন্ধের রূপশৈলী বিচারে সংক্ষিপ্ত অথচ মূল বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক একটি সমালোচনা হলো :

> নজরুলের প্রবন্ধগুলির শিল্পমূল্য বিচারের প্রথমেই স্মরণ রাখতে হবে, রচনাগুলির জন্মসূত্র সমকালের ঐতিহাসিক সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উপযোগিতার মধ্যে নিহিত। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই সংবাদপত্রের উপযোগিতার মধ্যে নিহিত। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় সঙ্কলন। ... কাগজের পূর্ব নির্ধারিত সীমা ও যথাসময়ের মধ্যে লিখিত হওয়ায়

> অধিকাংশ প্রবন্ধে অতি দ্রুততার চিহ্ন বর্তমান। প্রবন্ধগুলির আঙ্গিক অবিন্যস্ত। ... রচনাগুলির বক্তব্য ও উপস্থাপন অতিমাত্রায় ভাবালুতা আক্রান্ত, অতিশয়োক্তি, উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষার অতি ব্যবহার বক্তব্য অলঙ্করণের আড়ালে অস্পষ্টপ্রায়। বাক্যগঠনেও ত্রুটি দুলর্ক্ষ্য নয়। প্রবন্ধগুলিতে পৌরাণিক 'মিথের' ব্যবহার কবিতার মতো অনিবার্য নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে অকারণ। আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার নৈপুণ্য সত্ত্বেও রচনাগুলি অনেক ক্ষেত্রে গাম্ভীর্য হারিয়ে স্থুল হয়ে উঠেছে।
> ভাবাবেগ, উদ্দাম-ভাবালুতা নজরুলের গদ্যের দুর্বলতার দিক ঠিকই, তবে এটা তাঁর গৌরবেরও কারণ। ভাবাবেগই নজরুলের গদ্যরচনাকে রক্ষা করেছে, বহুলাংশে। ... বাংলা গদ্যে এরূপ বেগের সঞ্চার অতি স্বল্প প্রতিভার দ্বারা সম্ভব হয়েছে। (আকরম, ১৯৮৫ : ৭৯)

নজরুলের গদ্যে সঞ্চারিত আবেগের জন্য অবশ্য তাঁর কবিসত্তাকেই দায়ী করা হয়েছে, 'এই আবেগই গদ্য ভাষাকেও সাবলীল ও সহজ করতে সাহায্য করেছে।' (দিল আফরোজ, ২০০৫ : ২১)। এ প্রসঙ্গে আরো স্মর্তব্য :

> নজরুলের গদ্যে আবেগ প্রবণতার প্রাধান্যের সঙ্গে অন্য যে দিকটি প্রধান হয়ে উঠেছে তা হল নির্ভীকভাবে নিজের সত্যকে প্রকাশ করার শক্তি। ভাবের এই পৌরুষ গদ্যভঙ্গি ভাবাবেগের পাশাপাশি ভাষার শক্ত গাঁথুনিতে সহায়তা করেছে।
> সাময়িক প্রয়োজনে নজরুলের লিখিত হওয়া অনেক প্রবন্ধ কোন কোন সময় আত্মভাবে বিন্যস্ত হলেও ভাব প্রকাশের মুল গ্রন্থি বা ভাষার বৈশিষ্ট্য সর্বদা শিথিল হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে প্রচারগত দিক প্রাধান্য পাওয়ার মননশীলতার প্রতিফলন খর্বিত। (মনজুর, ১৩৯৯ : ৭)

নজরুলের প্রবন্ধ-রূপ সম্পর্কিত নানা আলোচনায় বলা হয়ে থাকে যে, কবিতায় তিনি যা বলতে চেয়েছেন তারই সরল ও সুষ্ঠু প্রকাশ তথা গদ্যরূপ হলো তাঁর প্রবন্ধগুলো। প্রবন্ধের ও কবিতার বিষয়-বক্তব্যের সাম্যের কারণেই কেবল নয়, নজরুলের গদ্যের অলংকরণ-সৌন্দর্য বিশেষত উপমা-চিত্রকল্প-শব্দচয়ন ইত্যাদি শিল্পগুণের কারণেই গদ্য একটা নিজস্ব ভঙ্গিমা পেয়েছে, যেখানে 'ভঙ্গিটি বক্তার, যাঁর দখলে শব্দ আছে অনেক, চিত্র আছে আরো বেশী।' (সিরাজুল, ১৯৯১ : ১৯৪)। নজরুল গদ্যের সমালোচনায় দেখা যাচ্ছে, তাঁর তেজস্বিতা মূল বক্তব্য প্রকাশের অনুকূলে নয় বলে মন্তব্য করা হলেও কেউ কেউ এও মনে করেন :

> এই সমস্ত রচনায় তিনি হয়ত উত্তেজিত ওজস্বী, কিন্তু সমস্ত চাঞ্চল্য ও শব্দাধিক্যকে জড়িয়ে আছে শিল্পের একটা শৃঙ্খলা। কোনো অবস্থাতেই শিল্পের দাবী ও মর্যাদার কথা তিনি বিস্মৃত হতে পারেননি। তিনি বলেছেন (ইব্রাহিম খাঁর কাছে লেখা চিঠিতে), দেখতে হবে গলার স্বর যেন গানের কবিতাকে চাপা না দেয়। চাপা দেয় নি। সেইখানেই তিনি বড় শিল্পী। (সিরাজুল, ১৯৯১ : ১৯৩)

সুতরাং শব্দ ব্যবহার (দৃশ্যগত ও শব্দগত), চিত্রকল্প, উপমা, মিথ এরকম নানা পরিচর্যাসমৃদ্ধ স্বতন্ত্র গদ্য রচনা করেই নজরুল প্রাতিস্বিক গদ্যকার হয়ে ওঠেন সমালোচকের কাছে। তাঁর গদ্য-অলংকার প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> নজরুল ইসলাম চিন্তা করেন চিত্রের সাহায্যে। সেখানে রয়েছে উপমার এক বিচিত্র বর্ণালী শোভাযাত্রা। ... উপমাগুলো যখন বর্ধিত, প্রসারিত হয় তখন তারা রূপ নেয় অতিকথনের

> (মিথ)। শুধু উপমা নয়, তিনি থাকতে চান শব্দের কোলাহলের ভিতরে। ... একের পর এক শব্দেরা জেগে ওঠে, একে অন্যকে সৃষ্টি করে। ... 'জরা' এলে 'জয়গান'ও এসে পড়ে, 'চেঁচাতে চেঁচাতে' বলা হলে 'বাঁশের চাচারি' আর বসে থাকে না। ... তাঁর গদ্যে শব্দাধিক্য আছে। ... ধ্বনিরা চিত্রকল্পের প্রতিপক্ষ নয়, পরিপূরক হয়ে ওঠে। (সিরাজুল, ১৯৯১ : ১৯৬-৯৭)

রুদ্র-মঙ্গল থেকে নজরুলীয় গদ্যের একটি উদাহরণ :

> নিশীথ রাত্রি। সম্মুখে গভীর তিমির। পথ নাই। আলো নাই। প্রলয় সাইক্লোনের আর্তনাদ বিভীষিকার রক্ত-সুর বাজাচ্ছে। তারই মাঝে মা'কে আমার উলঙ্গ করে নিয়ে চলেছে যে, সে দানবও নয়, দেবতাও নয়, রক্তমাংসের মানুষ। ধীরে ধীরে পিছনে চলেছে তেত্রিশ কোটি আঁধারের যাত্রী। (নজরুল, ১৯৯৭ : ১০১)

১.৪

সমালোচকেরা নজরুলের প্রবন্ধকে যেভাবে বিচার করেছেন, সেসব দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃতি নির্ণয়ে বলা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সমকালীনতা ও এগুলোর প্রাসঙ্গিকতার একটি ইতিহাসমূলক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে নজরুলের রাজনীতি চেতনা ও সমাজচিন্তা বার বার আলোচিত হয়েছে। এ দুটো প্রসঙ্গ মূল্যায়নে সমালোচকদের মধ্যে যাঁরা সচেতন ও অবচেতনে সমাজতাত্ত্বিক বা অনেকাংশে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যকে বিচার করতে আগ্রহী, নজরুল-সাহিত্যের সমালোচনায় তাঁদের স্বস্তি অনুভূত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে নজরুলকে বিচার করার প্রধান কারণ হতে পারে দুটি — প্রথমত, নজরুলের চিন্তার সাথে উক্ত তত্ত্বের সাম্য ও সমর্থন, দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকভাবে তাঁর সাহিত্যকর্মকে বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবং একই সাথে শৈল্পিক কর্মকাণ্ডের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা। যদিও তাত্ত্বিক কাঠামো ও সমালোচনার বিশেষ 'হাইপোথেসিস' প্রয়োগে নজরুলের প্রবন্ধকে বিচার করা হয়েছে এমন দাবি স্পষ্ট করে কেউ উত্থাপন করেননি। নজরুল প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের প্রতিনিধি এবং ত্রৈমাসিক-মাসিক-সাপ্তাহিক-দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে সমকালীন সমাজবাস্তবতার প্রকাশক। তাঁর প্রাবন্ধিক চেতনাপ্রবাহ 'নিগূঢ়ভাবে কালাশ্রয়ী ও ইতিহাসের স্রোতশৃঙ্খলিত'। সমকালের রাষ্ট্রিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সংগ্রাম-প্রতিবাদ ইতিহাস-ঐতিহ্য, তত্ত্ব-তথ্য তিনি ধারণ ও ব্যাখ্যা করেছেন একান্ত নিজস্ব প্যারাডাইমে। এ সময়ে তাঁর সাহিত্যকর্ম বিচারে 'উত্তর-উপনিবেশবাদী' দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতাও ব্যাখ্যাত হচ্ছে।[৩] তাঁর গদ্যরূপের বিচারে একান্ত রূপবাদী ভঙ্গির (Formalist approach of criticism) চর্চা সুবিধাজনক হলেও গদ্যস্রোতের অন্তস্থিত তীব্র আবেগের উৎস খুঁজতে কেবল শব্দের সেন্স-টোন ফিলিং-রিদম্-অ্যাক্শন অনুসন্ধান নয় বরং সমকালপিষ্ট ও চেতনার সংঘাতে 'অতিদ্রুত রূপান্তরাশ্রয়ী' নজরুলের শিল্পসত্তার কাছেই ফিরে যেতে হয় বার বার।

উপনিবেশবাদী শক্তির এই সময়ের বৈচিত্র্যিক আধিপত্যবাদ ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় রোধ করার দরকার আছে কী নেই তা নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বায়নের বিতর্কিত

অথচ স্বীকৃত সংজ্ঞায় আপন ঐতিহ্য, দেশ-ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি নবমূল্যায়নে প্রতিরোধ ও আত্তীকরণের দ্বিমুখী তত্ত্ব রয়েছে। সাংগঠনিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও মনোজাগতিক উপনিবেশবিরোধী চেতনার গড়নে যে রকম বিপ্লবই কাম্য থাকুক না কেন, তাকে অবিচল রাখবার শক্তি-অনুপ্রেরণা, আত্ম-অনুসন্ধানী স্বর, দৃপ্ত শক্তি নজরুল-প্রবন্ধ থেকে পাওয়া যেতে পারে, তাঁর প্রবন্ধের ব্যাখ্যাও এ দৃষ্টিকোণে বিচার্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

টীকা

১. 'নজরুলের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা' প্রবন্ধে আতাউর রহমান লেখেন : "তত্ত্বগত দিক থেকে নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় নৈরাজ্যিক চেতনার প্রকাশ খুব স্পষ্ট। বিপ্লবী যুগে ইউরোপে যে সব চিন্তানায়ক সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন তাঁদের অনেকের চিন্তায় নৈরাজ্যবাদী লক্ষণ দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে শুধু গডউইন প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নজরুল যে আইন-কানুনকে সহ্য করতে পারেন নি তা প্রকৃতপক্ষে নৈরাজ্যবাদী স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। নৈরাজ্যবাদী প্রুধর হুবহু প্রতিধ্বনি পাই — 'স্বরাজ মানে কী? স্বরাজ মানে নিজেই রাজা বা সবাই রাজা। আমি কারুর অধীন নই, আমরা কারুর সিংহাসন বা পতাকাতলে আসীন নই'— নজরুলের এই সব মন্তব্যে।" (আতাউর, ১৯৯১: ৭৭)। কিন্তু নজরুলের কাছে স্বরাজ বা রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি গুরুত্বপুর্ণ ছিল আত্মিক মুক্তি বা স্বাধীনতাও। সুতরাং তা নৈরাজ্যবাদী মতামত একথা বলা যায়না।

২. "তাঁর (নজরুল) নিকট সাম্যবাদ একটি দূরবস্থিত আদর্শ। ... এ আদর্শের প্রতি নজরুলের আকর্ষণ ও প্রতিক্রিয়া আবেগ-রঞ্জিত, মোহ-নীল। এ তাঁর যৌবন স্বপ্নের পরিণতি। কিন্তু গভীর ইতিহাসবোধ অথবা সমাজ প্রবাহের আন্তরিক উপলব্ধি থেকে যে নজরুল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা কোন মতেই বলা যায় না।"(অরবিন্দ, ১৯৯৯ : ২৭৩)

৩. "বর্তমান সময়ে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব (Post-colonial Theory) গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববীক্ষা হিসেবে বিবেচিত। ... আত্মসমীক্ষা এবং প্রতিরোধী চেতনাই উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের মৌল বৈশিষ্ট্য। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধী চেতনা, কেন্দ্র ও প্রান্তের সম্পর্ক নির্ণয়, প্রতিবাদী নারীভাবনা, মিথ-পুরাণের নবনির্মাণ, নিম্নবর্গ সম্পর্কে সচেতনতা, স্বদেশপ্রেম ও দেশজ প্রকৃতিলগ্নতা এবং আপসহীন দ্রোহচেতনাই হচ্ছে উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের প্রধান প্রধান দিক। উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের আলোকে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষিত হলে, ভিন্ন এক নজরুলকে আবিষ্কার করা সম্ভব।" (বিশ্বজিৎ, ২০১৩ : ৯)।

গ্রন্থপঞ্জি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৪০৯)। *কল্লোল যুগ*, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি, কলিকাতা।

অরবিন্দ পোদ্দার (১৯৯৯)। 'কবি নজরুল', *তোমার সাম্রাজ্যে, যুবরাজ*। (সম্পাদক হায়াৎ মামুদ ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত), নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা। পৃ. ২৬৮-২৭৪

আতাউর রহমান (১৯৯৯)। 'নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা', *তোমার সাম্রাজ্যে, যুবরাজ*। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯-৩২৯

আতাউর রহমান (১৯৯১)। 'নজরুলের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা', *নজরুল ইসলাম : নানা প্রসঙ্গ* (সম্পা. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম), নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা। পৃ. ৬৪-৮৪

আতোয়ার রহমান (১৯৯৪)। *নজরুল বর্ণালী*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (১৩৯৯)। 'নজরুলের প্রবন্ধ সাহিত্য', *দৈনিক ইনকিলাব* (শুক্রবার, ১৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা), ঢাকা।

দিল আফরোজ বেগম (২০০৫)। *গদ্য রচনায় নজরুল মানস*, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৯৯৭)। *নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র*, নূরুল হুদা ও রশিদুন নবী (সম্পাদক) নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৩)। *নজরুলমানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৩)। 'উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব ও নজরুল সাহিত্য', *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৯-২০

মনোয়ারা হোসেন (২০০০)। *নজরুলের প্রবন্ধ সাহিত্য*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম (২০১২)। *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃজন*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

সিদ্দিকা মাহমুদা (১৯৯৯)। 'নজরুলের প্রবন্ধ : সমাজচৈতন্য', *নজরুল সমীক্ষণ* (সম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা। পৃ. ৫২৭-৫৫০

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৯১)। 'নজরুল ইসলামের গদ্য রচনা', *নজরুল ইসলাম : নানা প্রসঙ্গ* (সম্পাদক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম), নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা। পৃ. ১৮৬-২০১

সুশীলকুমার গুপ্ত (১৯৯৯)। 'নজরুলের সাংবাদিকতা', *তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ*। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭-৪৮০

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৮৫)। *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হায়াৎ মামুদ (১৯৯৯)। 'যুবরাজ, তার চলাচল', *তোমার সাম্রাজ্যে, যুবরাজ*। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩-১৫